সংবাদ

তারিখ ... 30 APR 2017
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৩...

এমডিজি, এসডিজি এবং নারীর বাস্তবতা

লীনা পারভীন

আমরা সবাই জানি জাতিসংঘ ঘোষিত মিলিনিয়াম ডেভেলপম্যান্ট গোল (MDG) এর ৮টি লক্ষ্যের তৃতীয়টি ছিল জেন্ডার ইকুয়ালিটি এবং নারীর ক্ষমতায়ন যা ২০১৫ সালে সমাপ্ত হয় এবং একই সালে ঘোষিত সাসটেইনেবল ডেভেলপম্যান্ট গোল(SDG) এর মোট ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ৫ নম্বরে আছে সে একই লক্ষ্য। এমডিজির সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেয়েছিলো অন্যতম অনুকরণীয় দেশ হিসাবে। অবশ্যই সরকারের ভূমিকা এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে নারী শিক্ষা আরও বিশেষ করে বললে প্রাথমিক শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণের হার বেড়েছে প্রশংসনীয় হারে। অস্বীকার করার কোন যুক্তি নাই যে নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। সমাজের প্রচলিত ধারণাই ছিল সংসারের কাজেই মেয়েদের অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ থাকবে, যদিওবা কেউ কেউ স্কুলে যেত কিন্তু কখনোই সেটা প্রাথমিকের পরে আর যেত না।

সে জায়গা থেকে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে নারীদের স্কুলে আসার হার বেড়েছে অনেক। কেবল প্রাথমিকে নয়, উচ্চশিক্ষাতেও বেড়েছে নারীর অংশগ্রহণ। উচ্চশিক্ষার হার বাড়ার কারণে নারীদের বাইরে আসার হারেও এসেছে পরিবর্তন। বেড়েছে কর্মজীবী নারীর সংখ্যাও। এই কর্মসংস্থান শুধু অফিসে আদালতেই নয়। নারী উদ্যোক্তার সংখ্যাও কম নয়। নারীরা এখন নিজেই তৈরি করছে নিজের কর্মস্থল। সেখানে আবার তৈরি হচ্ছে অন্যদের কর্মের সংস্থান। সরকারের কারিগরি শিক্ষার এক্ষেত্রে রয়েছে এক বিরাট ভূমিকা। বেসরকারি পর্যায়ে কিছু সংস্থার ভূমিকাও অস্বীকার করবার মতো নয়।

এসব অগ্রগতির মাঝেও মাঝে মাঝে কিছু ঘটনা মনে সংশয় জাগায়, নারীরা কী আসলেই ক্ষমতাবান হয়েছে? নারীর কী সত্যিকার অর্থেই আর্থিক মুক্তি ঘটেছে? সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এসেছে? নিজের উপার্জন নিজের মতো করে ভোগ করার মত স্বাধীনতা কী তারা পেয়েছে? এখনো নারীরা কী আপন শক্তিতে উদ্ভাসিত? কতজন নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিজের ওপর? প্রশ্ন আছে এই যে নারীদের বাইরে আসা, কর্মজীবী হয়ে উঠা, অর্থ উপার্জনে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এর পুরোটাই কী নারীর প্রয়োজনে ঘটেছে? নাকি এর পিছনে অন্য কারণও আছে? বাস্তবে আমরা একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবো, নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের পেছনে খুব সুক্ষভাবে হলেও রয়েছে তাদের পরিবারের এক ধরনের আর্থিক মুক্তির প্রয়োজনীয়তা। অর্থাৎ নারীর আর্থিক সঙ্গতি পরিবারের স্বচ্ছলতা নিয়ে আসতে সাহায্য করে এই বোধ যখন থেকেই এই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় নিয়ন্ত্রিত সমাজ উপলব্ধি করেছে তখন তারা গ্রহণ করেছে নারীকে বাইরে আসতে দেয়াকে। আর এটাই একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে নারীর নিজের উপার্জনের উপর নিজের অধিকার না থাকার। আমাদের চারপাশে প্রচুর শিক্ষিত নারী আছে যাদের জন্য বাইরে এসে কাজ করাটা একপ্রকার নিষিদ্ধ হিসাবে মানা হয় আর যদি পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকে তাহলে প্রথমেই আসে সংসারে কী অভাব পড়েছে যে ঘরের মেয়ে চাকরি করবে উপার্জন করবে? এক্ষেত্রে অনেক নারীরাও একই ধারণা পোষন করে। আবার কেউবা কেবল সময় কাটানোর জন্য হলেও কাজে যোগ দিয়ে থাকে। তার মানে একজন শিক্ষিত এবং সক্ষম নারীর কাজ করাটাও নির্ধারিত হয় সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতার মাধ্যমে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে বেশিরভাগেরই একই মানসিকতা। আর যেসব নারীরা নিজের অস্তিত্বের জন্য, মর্যাদা রক্ষার জন্য অর্থ উপার্জন করতে চায় বা সেও যে একজন সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে সমাজে অবদান রাখতে পারে বলে নিজেকে আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করতে চায় তাদের জন্য রয়েছে পদে পদে বাধা। খুব বেশি মসৃণ নয় তাদের এই চলার পথ।

সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল রাজনীতিতে, প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো। এবং এক্ষেত্রেও সরকার সফল বলা যায়। কারণ আমাদের দেশে স্পিকার একজন নারী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদেও এখন নারীদের দেখা যাচ্ছে। প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চপদে এখন নারীদের দেখা যাচ্ছে। বিচার বিভাগের বিভিন্ন সম্মানজনক পদেও রয়েছে নারীর অংশগ্রহণ। সংখ্যার অর্থে দেখে গেলে বাংলাদেশ সরকার অন্য কোন দেশের তুলনায় বেশ ভালো একটি অগ্রগতি নিয়ে এসেছে। কিন্তু একটা বিষয় আমরা ভেবে দেখিনি সেটা হচ্ছে এই যে নারীর সংখ্যাগত ক্ষমতায়ন এর পিছনে কতটা নির্বাহী ক্ষমতার প্রভাব আর কতটা সমাজে জেন্ডারভিত্তিক সমতাকে সামনে রেখে করা হয়েছে? বিশ্লেষণ করে দেখলে সহজেই বুঝা যাবে যে এর বেশিরভাগই ঘটেছে জাতিসংঘের টার্গেটকে সামনে রেখে শুধু সংখ্যাগত পরিবর্তন। গুণগত পরিবর্তনের দিকটি রয়ে গেছে অবহেলিত। গুণগত পরিবর্তন কখনো বছরের হিসাবকে বেঁধে রেখে করা যায় না। সংখ্যার পরিবর্তন হয়তো সরকারকে সারা বিশ্বে সফলতা এনে দিয়েছে কিন্তু গুণগত পরবর্তনকে অবহেলা করলে সে স্বীকৃতি হবে ক্ষণস্থায়ী। সরকারী সংস্থা বিবিএসের হিসাবেই এসেছে যে আমাদের সমাজে এখনও প্রায় ৮০ ভাগ শিক্ষিত নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়। এই হিসাব কি নির্দেশ করে? শিক্ষিত নারীরাই যদি এখনও পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয় তাহলে গ্রামগঞ্জের আনাচে-কানাচে থাকা নারীদের অবস্থা সহজে অনুমেয়। এর কারণ কী হতে পারে? বিশ্লেষণ করেছি কী আমরা? বিবিএসের এই পরিসংখ্যান কী সরকারের বিভিন্ন মহল তাদের এজেন্ডায় এনেছেন? নারীবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি কী? চোখে পড়েনি। তার মানে সমস্যার সমাধানে আমাদের আন্তরিকতার ঘাটতি আছে।

কিছুদিন আগেই আরেকটি পরিসংখ্যানে চোখ আটকে গেল। একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত যে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা আবার হ্রাস পাচ্ছে। ৩৬% থেকে নেমে সেটা দাঁড়িয়েছে ৩৩% এর মত। ভয়াবহ চিত্র। এ রকম অনেক পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে খুঁজতে গেলে কিন্তু বাস্তব চিত্র বোঝার জন্য সরকারি পরিসংখ্যানের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। আমাদের চারপাশে তাকালেই বোঝা যায়। পারিবারিক চিত্র এখনও নারীর জন্য সহায়ক হয়ে উঠেনি। নারীর বাইরে যাওয়াকে এখনও সমাজ তার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জায়গায় আসেনি। সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নারী সে যত শিক্ষিতই হোক, তার মতো দেবার অধিকার এখনও নির্ভর করে পরিবার তাকে কতটা স্পেইস দিচ্ছে তার ওপর। নারীর উপার্জন আছে কিন্তু নেই উপার্জনের ওপর নিজের ১০০ ভাগ অধিকার। যতদিন নারীর নিজের অর্থের ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না, সম্পত্তিতে অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে না ততদিন সমাজে নারীরা পুরপুরি স্বাধীন বলে বলা যাবে না। সংখ্যাগত অগ্রগতির পাশাপাশি অবশ্যই কাজ করতে হবে জেন্ডারভিত্তিক সমতার জন্য। সমাজে জেন্ডার কী, কেন জেন্ডারভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা প্রয়োজন সে বিষয়ে নিতে হবে সরকারি উদ্যোগ। সরকারের অতিদ্রুত এমডিজি অর্জনের পেছনে একটি বড় ভূমিকা ছিল নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ। আর তাই জেন্ডারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এবং নারীর এই অগ্রগতিকে চিরস্থায়ী করতে শিক্ষা ব্যবস্থাই রাখতে পারে একটি বড় ভূমিকা।

কিন্তু মৌলবাদী প্রেক্ষিপশনে পরিবর্তন করা শিক্ষাক্রম কতটা এ দাবিকে সমর্থন করে? বাংলাদেশে একদিকে চলছে একটি বিশেষ ধর্মকে হাতিয়ার করে পাঠ্যক্রমের ডিজাইন অন্যদিকে আমরা নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর স্বাধীনতার কথা বলছি। মৌলবাদী রাজনৈতিক ভাবাদর্শের রাজনৈতিক দলগুলো কখনই নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, নারীর উচ্চশিক্ষাকে তারা অনৈসলামিক বলে মনে করে নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজকে তারা ঘৃনা করে। নারীর বাইরে বেরিয়ে এসে কাজ করাকে তারা বেপর্দার কাজ বলে মনে করে। শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের টার্গেট করে আর যাই হোক নারীর ক্ষমতায়নের যে অর্জন তাকে কখনো ধরে রাখা যাবে না নারীপুরুষের সমতা তো অনেক দূরের কথা। বাস্তবের চিত্র তাই আমাদের কাছে খুব আশঙ্কার। আমরা জানি না মিলিনিয়াম ডেভেলপম্যান্ট অর্জনে সফল পাওয়া সরকার কীভাবে তার সামনের চ্যালেঞ্জ সাসটেইনেবল ডেভেলপম্যান্টকে অর্জন করবেন। যে অর্জন স্থায়ী হয় না তাকে অর্জন বলা যায় না। আর স্থায়ী অর্জন ছাড়া সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা শুধু স্বপ্নই থাকে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর